মসলা ফসল

- পেঁয়াজ
- মরিচ
- রসুন
- হলুদ
- ধনিয়া
- আদা
- গোলমরিচ
- বিলাতি ধনিয়া
- কালোজিরা
- মেথী

বাংলাদেশে মসলা খুবই জনপ্রিয়। প্রধান প্রধান মসলার মধ্যে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, হলুদ, ধনিয়া, আদা, গোলমরিচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব মসলার আবাদি জমির পরিমাণ ৩.৮৭ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন ১২.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

দেশে প্রতি বৎসর ব্যবহৃত মসলার বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মসলার ফলন অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব।

পেঁয়াজ

গোলমরিচ

পেঁয়াজ

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের বেশ ঘাটতি রয়েছে। প্রতিবছর পেঁয়াজ আমদানি করে এ ঘাটতি পূরণ করা হয়। বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেঁয়াজের ফলন বাড়ানো সম্ভব। পেঁয়াজ একদিকে একটি মসলা এবং অপরদিকে একটি সবজিও বটে। বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাষ সাধারণত রবি মৌসুমে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সম্প্রতি খরিফ মৌসুমে আবাদ উপযোগী পেঁয়াজের ৩টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। আশা করা যায়, এসব জাতের ব্যাপক চাষাবাদের মাধ্যমে পেঁয়াজের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে।

পেঁয়াজের পাতা ও ডাঁটা ভিটামিন 'সি' ও 'ক্যালসিয়াম' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষা করা হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন।

পেঁয়াজ ফসল

পেঁয়াজের জাত

বারি পেঁয়াজ-১ (রবি)

বাছাইকরণের মাধ্যমে 'বারি পেঁয়াজ-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৬ সালে জাতটি চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতটির কন্দের আকার চেপ্টা ও গোলাকার। গাছ উচ্চতায় ৫০-৫৫ সেমি। জাতটির কন্দ অধিক ঝাঁঝযুক্ত এবং প্রতি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়। প্রতি কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৬ টন। হেক্টরপ্রতি বীজের ফলন ৬০০-৬৫০ কেজি।

'বারি পেঁয়াজ-১' জাতের পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি। জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। 'বারি পেঁয়াজ-১' পার্পল ব্লচ ও স্টেমফাইলাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি পেঁয়াজ-১

বারি পেঁয়াজ-২ (খরিফ)

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাইকরণ পদ্ধতিতে 'বারি পেঁয়াজ-২' নামে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এই জাতটি ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে চাষোপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার আকৃতির এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪৫ সেমি এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৩৫-৫৫ গ্রাম হয়ে থাকে। আগাম চাষের জন্য মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বপন করা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবী চাষের জন্য জুন-জুলাই মাসে বীজ তলায় বীজ বপন করা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-২

বারি পেঁয়াজ-৩ (খরিফ)

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাইকরণ পদ্ধতিতে 'বারি পেঁয়াজ-৩' জাত উদ্ভাবন করা হয়। এই জাতটি ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এই জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে চাষ উপযোগী ও স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার আকৃতির এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫-৫০ সেমি এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম।

নাবীতে বীজ বপনের জন্য মধ্য-জুন থেকে মধ্য-জুলাই মাস উপযুক্ত সময় এবং মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। আগাম চাষে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হচ্ছে মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ এবং এপ্রিল মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বারি পেঁয়াজ-৩

বারি পেঁয়াজ-৪

'বারি পেঁয়াজ-৪' জাতটি ২০০৮ সালে মুক্তায়িত একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন পেঁয়াজ। আকৃতি গোলাকার, রং ধূসর লালচে বর্ণের এবং ঝাঁঝযুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি এবং প্রতিটি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়। প্রতিটি বাল্বের গড় ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-৪

বারি পেঁয়াজ-৫

'বারি পেঁয়াজ-৫' গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি সারা বছরব্যাপী আবাদ করা যেতে পারে। আকৃতি চেপ্টা গোলাকার এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের গড় উচ্চতা ৪৫-৫৫ সেমি এবং প্রতিটি বাল্বের গড় ওজন ৫৫-৭০ গ্রাম হয়ে থাকে। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮-২০ টন।

বারি পেঁয়াজ-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া

দোআঁশ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। মাটি উর্বর এবং সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রচুর দিনের আলো, সহনশীল তাপমাত্রা ও মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকলে পেঁয়াজের ফলন খুব ভাল হয়। রবি পেঁয়াজের ক্ষেত্রে ১৫-২৪° সে. তাপমাত্রা পেঁয়াজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী। ছোট অবস্থায় যখন শেকড় ও পাতা বাড়তে থাকে তখন ১৫° সে. তাপমাত্রায় ৯-১০ ঘন্টা দিনের আলো এবং গড় আর্দ্রতা ৭০% থাকলে পেঁয়াজের কন্দ ভালভাবে বাড়ে, বীজ গঠিত হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। মাটির পিএইচ ৫.৮-৬.৫ হলে পেঁয়াজের ফলন ভাল হয়। সমুদ্র তীর থেকে ২১০০ মিটার উচ্চ পাবর্ত্য উপত্যকাতেও পেঁয়াজের চাষ করা যায়। হালকা মাটিতে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে পেঁয়াজের ফলন ভাল হয়। অধিক ক্ষার বা অম্ল মাটিতে পেঁয়াজের আকার ছোট হয় ও পুষ্ট হতে বেশি সময় লাগে।

বীজতলা তৈরি

বীজতলা ৩ × ১ মিটার আকারের হতে হবে। প্রতি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম বীজ বুনতে হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য ৩ × ১ মিটার আকারের ১২০-১৩০টি বীজতলার প্রয়োজন।

বীজের পরিমাণ

বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ৩.৫-৪ কেজি। অপরদিকে সরাসরি জমিতে বীজ বুনে পেঁয়াজ চাষে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৬-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। বীজ উৎপাদনের জন্য কন্দের আকারভেদে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১-১.২ টন কন্দের প্রয়োজন।

জমি তৈরি

গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। পেঁয়াজের জমি চাষের জন্য ডিস্ক হ্যারো ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এতে মাটি পুনরায় শক্ত হয়ে যায়। আগাছামুক্ত ঝুরঝুরে সমতল মাটি পেঁয়াজের জন্য উত্তম।

রোপণ পদ্ধতি

সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সমি এবং পেঁয়াজ থেকে পেঁয়াজের দূরত্ব ১০ সেমি রাখতে হবে। সরাসরি জমিতে বীজ বুনে, কন্দ ও চারা রোপণ করে পেঁয়াজ উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে অর্থাৎ রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে এমনকি সারা বছরের ফসল রূপে পেঁয়াজের চাষ হয়। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বীজতলায় বীজ বুনে, চারা তুলে সেই চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সরাসরি ছোট ছোট কন্দ লাগিয়েও পেঁয়াজের চাষ করা যায়। সাধারণত অক্টোবর থেকে নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) মাসে বীজতলায় বীজ বোনা হয় এবং ৫০-৫৫ দিন পর চারা জমিতে রোপণ করা হয়। সমগ্র উত্তরাঞ্চল, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর অঞ্চলে সারা বছর ধরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই এবং বর্ষাকালে জুলাই থেকে অক্টোবর এবং শীতকালে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসে পেঁয়াজ চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণ (রবি)

রবি মৌসুমে পেঁয়াজ চাষে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৮-১০ টন
ইউরিয়া	২৪০ কেজি
টিএসপি	২২০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি

সার প্রয়োগ

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম এবং ইউরিয়া ও এমওপি সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। কন্দ বা সরাসরি বীজ বপন করে চাষ করার ক্ষেত্রেও মোটামুটিভাবে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি (খরিফ)

হালকা দোআঁশ মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ আকারে বেশ বড় হয় এবং সেগুলো অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। খরিফ পেঁয়াজ চাষে হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয় পরিমাণ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে পরিমাণ	
			১ম কিস্তি (২০-২৫ দিন পর)	৩য় কিস্তি (৪০-৪৫ দিন পর)
গোবর/কম্পোস্ট	৭ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	২৪০ কেজি	-	১২০ কজি	১২০ কেজি
টিএসপি	২২০ কেজি	সব	-	-
এমওপি	২৫০ কেজি	১২৫ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-

পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুমের শুরুতে যদি পিএইচ-এর অপর্যাপ্ততা দেখা দেয় তাহলে পুষ্টিজনিত অভাবের কারণে ফলন কম হবে। জমি প্রস্তুত করার ২-৩ দিন পূর্বে পরিমাণমত চুন প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

পেঁয়াজের জমিতে মাটির প্রয়োজনীয় রস না থাকলে প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর পানি সেচ প্রয়োজন। পেঁয়াজের কন্দ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফুলের কলি দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তা ভেঙ্গে দিতে হবে। পেঁয়াজ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পেঁয়াজের জমিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছত্রাক রোগ দমন

গাছের বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে রোভরাল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম এবং রিডোমিল প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে। এরপর ১৫ দিন অন্তর বীজ দানা বাঁধা পর্যন্ত উক্ত ছত্রাকনাশক কয়েকবার স্প্রে করতে হবে। স্টেমফাইলাম ছত্রাকের আক্রমণ না থাকলে প্রথম স্প্রে করার পর পরবর্তী সময় শুধু রোভরাল স্প্রে করলেই চলবে। এভাবে রোগ দমন করে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬০০-৬৫০ কেজি বীজ উৎপাদন সম্ভব।

বীজতলায় চারা তৈরি

এক হেক্টর জমিতে রোপণের উপযুক্ত চারা তৈরি করার জন্য প্রায় ৩০০ বর্গমিটার জমির প্রয়োজন। বীজতলায় ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে মাটি ঝুরঝুরে করা হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হারে ব্লুকপার মিশিয়ে বীজতলার মাটি শোধন করে নেয়া উচিত অথবা বীজতলার উপর ১০ সেমি পুরু করে খড় বিছিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বীজতলা শোধন করা যেতে পারে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়। প্রতিটি বীজতলায় ৩-৫ ঝুড়ি পচা গোবর সার ও ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে এবং উপরে সামান্য কাঠের ছাই ছড়িয়ে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। এরপর প্রত্যেকটি বীজতলায় ২৫-৩০ গ্রাম বীজ বুনে, ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ১ সেমি পুরু করে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা সেচ দিয়ে বীজতলা ভালভাবে ভিজিয়ে দিত হবে এবং তারপর প্রয়োজন অনুসারে ২-৩ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। বোনার প্রায় ৫-৭ দিন পর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা বের হয়ে আসে। চারা ছোট অবস্থায় বীজতলায় প্রচুর আগাছা জন্মে এবং উক্ত আগাছাসমূহ পরিষ্কার করে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। উৎপন্ন চারা মূল জমিতে রোপণ করলে কন্দ বড় হয় এবং ফলন বেশি হয়। তাছাড়া সার প্রয়োগ ও পরিচর্যার কারণে রোগ এবং পোকার আক্রমণ কম হয়। বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিন পর চারা যখন ১৫-২০ সেমি উঁচু হয় তখন জমিতে রোপণের উপযুক্ত সময়।

সেচ (খরিফ)

পেঁয়াজ চাষের জন্য সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। সেচ সাধারণত বৃষ্টিপাত, বোনার সময়, মাটির অবস্থা ও চারা বা কন্দের উপর নির্ভর কর। পেঁয়াজের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন। এঁটেল মাটি থেকে হালকা মাটিতে বেশি সেচের প্রয়োজন হয়। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৩ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। কন্দ গঠিত হয়ে গেলে সেচ কম লাগে এবং পেঁয়াজের বাল্ব পরিপক্ক ও সংগ্রহের ক্ষমতা হ্রাস পায়। পেঁয়াজ ফসল দীর্ঘদিন সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে এবং হঠাৎ করে সেচ দিলে কন্দের শল্কপত্র ফেঁটে যেতে পারে এবং বাজার মূল্য দারুণভাবে কমে যেতে পারে। তাই সব সময় যেন জমিতে 'জো' থাকে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শস্য বিন্যাস

(ক) রোপা আমন-পেঁয়াজ, পাট-পেঁয়াজ (গ্রীষ্ম), রোপা আমন-সরিষা-পেঁয়াজ এবং রোপা আমন-আলু-পেঁয়াজ।

(খ) সাথী ফসল: আখ+পেঁয়াজ, আলু+পেঁয়াজ, মরিচ+পেঁয়াজ।

অন্যান্য প্রযুক্তি

পেঁয়াজের আকার

প্রতি কেজিতে ৬০-৭৫টি পেঁয়াজ ধরে এরূপ পেঁয়াজ রোপণ কতে হবে।

রোপণ দূরত্ব

সারি থেকে সারি দূরত্ব ২৫ সেমি এবং পেঁয়াজ হতে পেঁয়াজের দূরত্ব হবে ২০ সেমি।

সারের পরিমাণ

বীজ উৎপাদনের জন্যে পেঁয়াজের জমিতে সকল পরিচর্যাসহ সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ পেঁয়াজের জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে দেয়	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
ইউরিয়া	২৫০ কেজি		১২৫ কেজি	১২৫ কেজি
টিএসপি	২৭৫ কেজি	৭৫ কেজি		
এমওপি	১৫০ কেজি	সব	৪০ কেজি	৩৫ কেজি
বোরাক্স	৫ কেজি	সব		
গোবর	৮-১০ টন	সব		

সেচ প্রয়োগ

সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

মরিচ

মরিচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে এটি মূলত মসলা হিসেবে পরিচিত। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই এ ফসলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পাকা মরিচের তুলনায় কাঁচা মরিচ ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। মরিচ উৎপাদনে আগাছা একটি বিশেষ সমস্যা। সঠিক সময়ে আগাছা দমন না করলে মরিচের ফলন ৬০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আগাছা দমন না করলে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যাহত হয় অন্যদিকে আয় কম হয়।

মরিচ

মরিচ ফসল

মরিচের জাত

বারি মরিচ-১

মরিচের এ জাতটি ২০০১ সালে অবমুক্ত হয়। জাতটির গাছ খাটো, ঝোপালো, উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি এবং পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেমি।

বারি মরিচ-১

প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি মরিচ ধরে। মরিচের ত্বক পুরু। গাছপ্রতি ৭০০-৭৫০ গ্রাম কাঁচা মরিচ পাওয়া যায়। কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়। জাতটি সারা বছর চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন কাঁচা মরিচ এবং ২.৫-৩ টন শুকনা মরিচ।

বারি মরিচ-১ এর ফসল

এছাড়া, দেশের স্থানীয় জাতগুলোর মধ্যে শেরপুরের বালুঝরি, মানিকগঞ্জের বিন্দু, কুমিল্লার ইরি মরিচ, মিঠা মরিচ, বালুঝুরি, নরসিংদীর বাওয়া, পাবনার হলেন্দার, কুষ্টিয়ার গোলমরিচ, আলমডাঙ্গা মরিচ, মাগুরার টেঙ্গাখালি, জামালপুরি, মাঠউবদা (মোটা জাত, কালোজাত, সাদা জাত) মরিচ, বগুড়ার তরনি, নয় মাইল, ঝালশুকা এবং বগুড়া দীঘলা উল্লেখযোগ্য।

বারি মরিচ-২

মরিচ (*Capsicum annuum* L). সোলানেসী পরিবারভুক্ত বিরুৎ জাতীয় মৌসুমী ফসল। এটি বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। দৈনন্দিন রান্নায় মরিচের ব্যবহার অনস্বীকার্য। সারাবছর ব্যাপী এ ফসলের চাহিদা ব্যাপক। বাংলাদেশে ৯৭,১৬৬ হেক্টর জমিতে ১,২৬,০০০ মে. টন মরিচ উৎপাদিত হয় (বি বি এস, ২০১২)। পুষ্টিমানে কাচা মরিচ ভিটামিন 'এ' ও 'সি' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে মরিচ সহজলভ্য হলেও খরিফ-২ (জুলাই-অক্টোবর) মৌসুমে বাজারে মরিচের স্বল্পতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সময়ে মরিচের দাম বেশি থাকে। বর্ষা ও শীত মৌসুমের পূর্বে এই সময়টিতে মরিচের উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণের নিরলস প্রচেষ্টায় ৭ (সাত) টি মরিচের জার্মপ্লাজম কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে ৫-৬ বছর যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে C0445 জার্মপ্লাজমটি নির্বাচন করা হয় এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে দুই বছর পরীক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ণ করা হয়। পরবর্তী কালে এটি 'বারি মরিচ-২' নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে মুক্তায়িত হয়। জাতটি দেশে কাঁচা মরিচের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

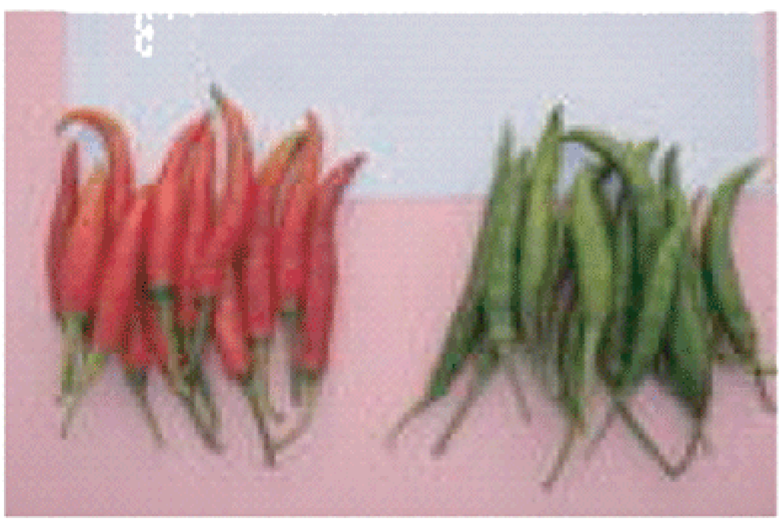

বারি মরিচ-২

এটি একটি গ্রীষ্মকালীন জাতের মরিচ। গাছ লম্বা ও ঝোপালো। উচ্চতা ৮০-১১০ সেমি, গাছের পাতার রং হালকা সবুজ। গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৭টি, প্রতিগাছে মরিচের সংখ্যা ৪৫০-৫০০টি (ওজন ১১০০ গ্রাম)। প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ৭.০-৭.৫ ও প্রস্থ ০.৭-১.০ সেমি, ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম। জাতটির ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৪.৫ গ্রাম। এই জাতের মরিচের ত্বক পুরু। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পাকা অবস্থায় লাল রং এর হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী থাকে। এ জাতের মরিচের জীবন কাল প্রায় ২৪০ দিন (মার্চ-অক্টোবর)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন (সবুজ অবস্থায়)।

বারি মরিচ-২ এর ফসল

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া

পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত বেলে-দোআঁশ থেকে এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। সব মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ফলন ভাল হয় না। মাটির পিএইচ ৬.০-৭.০ হলে মরিচের উৎপাদন ভাল হয়। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারী ও উঁচু ভিটা যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে 'জো' আসে সেখানে মরিচ ভাল হয়।

মরিচ গ্রীষ্ম প্রধান জলবায়ু উপযোগী ফসল। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে নিম্ন তাপের কারণে গাছের বৃদ্ধি কিছুটা ব্যাহত হয় ও অতিরিক্ত ঠান্ডায় মরিচের ঝাঁঝ কমে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির (২০-৩০° সে. তাপমাত্রা) সঙ্গে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হতে থাকে। তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নিচে বা ৩৫° সে. এর বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন সাধারণত কমে যায়। দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে ৭৫ সেমি থেকে ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত হয় এবং মাঝে মাঝে রোদ হয় সেসব অঞ্চলে মরিচের ফলন ভাল হয়। ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় অল্প বৃষ্টিপাত এবং গাছের বৃদ্ধির সময় পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে মরিচ ভাল জন্মে।

উৎপাদন মৌসুম

রবি মৌসুমের জন্য ১-৩০ সেপ্টেম্বর ও খরিফ মৌসুমের জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ মরিচ উৎপাদনের উপযুক্ত সময়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি চারা তৈরির জন্য বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি

বীজতলার মাটির উপর ৩-৪ সেমি ধানের খড়ের স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে মাটি শোধন করতে হবে। আমাদের দেশে দুইভাবে জমিতে মরিচ লাগানো হয়-(১) সরাসরি বীজ বপন, (২) বীজতলায় চারা তৈরি করে পরে জমিতে রোপণ।

রবি মৌসুমে সরাসরি বীজ বপন করলে ২.৫-৩.০ কেজি/হেক্টর এবং রবি ও খরিফ মৌসুমে বীজতলায় চারা তৈরি করলে ৮০০-১০০০ গ্রাম/হেক্টর বীজের প্রয়োজন হয়। প্রথমে শোধিত বীজ (ভিটাভেক্স ১ গ্রাম/কেজি) হাতের মুঠোয় নিয়ে সমানভাবে জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাটির লেভেল হতে ১ সেমি গভীরে বীজ বপন করতে হবে।

বীজ মাটির বেশি নিচে গেলে অঙ্কুরোদগম কম হয়। বীজ গজানোর পর চারা ৩-৪ সেমি লম্বা হলে অতিরিক্ত চারা পাতলা করতে হবে। রবি মৌসুমে চারা এমনভাবে রাখতে হবে যেন সারি থেকে সারি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেমি হয়। খরিফ মৌসুমে মূল জমিতে ৫০ × ৫০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে।

চারার পরিচর্যা

বীজ বপনের পর বীজতলায় বীজ যাতে পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে মাটিতে দিতে হবে। বীজ বপনের পর প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। চারা তৈরি হলে ইনসেক্ট প্রুফ নেট নিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। এই নেট রোদ, বৃষ্টি এবং ভাইরাস বহণকারী বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে চারাকে রক্ষা করবে। বীজ বুনার পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত নেটের উপর ঝরনা দিয়ে সেচ দেওয়া আবশ্যক। বীজতলায় আগাছা গজালে ১-২ বার নিড়ানি দিয়ে আগাছা বেছে মাটি আলগা করে দিলে চারা ভাল হয়। চারা তোলার আগের দিন বীজতলায় সেচ দিলে মাটি নরম হয়। এতে শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজেই চারা তোলা যায় এবং চারা সহজেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা লাগানোর জন্য ভাল। চারা রোপণ মুহূর্তে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

জমি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৬টি চাষ ও মই দিতে হবে। প্রথম চাষ গভীর হওয়া দরকার। শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় গোবর, টিএসপি, জিপসাম এবং প্রায় ১/৩ অংশ এমওপি মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের প্রয়োজনে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে। প্রত্যেক ভিটায় দুই সারি চারা লাগানোর পর উভয় পার্শ্বে ২৫ সেমি জায়গা খালি থাকবে।

সার প্রয়োগ

ভাল ফলন পেতে হলে মরিচের জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ২৫, ৫০ এবং ৭০ দিন পর পর্যায়ক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তিতে গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি দূরে ছিটিয়ে ভিটির মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২১০ কেজি	-	৭০	৭০	৭০
টিএসপি	৩৩০ কেজি	সব	-		
এমওপি	২০০ কেজি	৬৫ কেজি	৪৫	৪৫	৪৫
বোরাক্স	৫ কেজি	-	-	-	-

হরমোন প্রয়োগ

প্ল্যানোফিক্স নামক হরমোন প্রয়োগে দেখা গেছে মরিচের ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। এক মিলি প্ল্যানোফিক্স ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুল আসলে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০০ লিটার মিশ্রণের প্রয়োজন হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। চারার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচের খুবই প্রয়োজন। সেচের প্রয়োজনীয়তা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা যায়। এই চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে শিকড় প্রয়োজনীয় আলো বাতাস পায়। এতে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

মরিচ উৎপাদনের সমস্যা

শীত কালে মরিচ চাষে উপযুক্ত জমির সংকট রয়েছে। কারণ শীত মৌসুমে বেশির ভাগ জমি ভুট্টা, আলু, সবজি ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বলে প্রতিযোগিতায় মরিচের জন্য জমি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। মরিচ চাষে উচ্চ ফলনশীল জাত, প্রযুক্তির অভাব এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের অভাব রয়েছে। মরিচ চাষে প্রধান অন্তরায় হলো মরিচের বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস রোগ। এসব রোগের মধ্যে মোজাইক ভাইরাস,

লিফ কার্ল, ব্যাকটেরিয়াল স্পট, এ্যানথ্রাকনোজ, ফিউজারিয়াম উইল্ট, পচা রোগ ইত্যাদি প্রধান সমস্যা। এছাড়া, বর্তমানে নেমাটডও মরিচ চাষের সমস্যা। মরিচ চাষে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব রোগের চেয়ে কম। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের অভাবে কৃষক উভয় মৌসুমে মরিচের আবাদ বাড়াতে পারছে না যদিও মরিচ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক ফসল হিসেবে প্রমাণিত।

বীজ উৎপাদন

মরিচ পরপরাগায়িত ফসল । কিছু কিছু জাতে স্ব-পরাগায়ণ হতে পারে। তবে শতকরা ৯০ ভাগ মরিচে পর-পরাগায়ণ হয়ে থাকে। এ কারণে মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হলে বীজ ফসল আলাদা করে লাগাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এক জাতের মরিচের জমির চারপাশে অন্তত ৪০০ মিটারের মধ্যে অন্য কোন মরিচের জাত না থাকে। তবে অল্প পরিমাণ বীজের জন্য ক্ষেতের সুস্থ সবল নির্বাচিত গাছের ফুল স্ব-পরাগায়িত করে সেগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্ব-পরাগায়ণের জন্য সাদা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ফুল পরাগধানী বিদারণের আগেই ঢেকে দিতে হবে। পরিপক্ক, পুষ্ট এবং উজ্জ্বল লাল রঙের মরিচ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত একটি মরিচে ৭০-৭৫টি বীজ থাকে এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অনুসরণ করলে প্রতি হেক্টরে ৮০-৮৫ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

ফসল সংগ্রহ

মরিচ কাঁচা এবং পাকা দুই অবস্থায় তোলা হয়। চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরতে শুরু করে, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল ধরে এবং ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে আরম্ভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সংগৃহীত ফসল কাঁচা মরিচ হিসেবে গণ্য করা হয়। পরে মরিচ পাকা (লাল রং) হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। সবুজ চকচকে, মসৃণ ত্বক এবং মাঝারী ঝাঁঝের কাঁচা মরিচের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। অন্যদিকে পাকা মরিচ, উজ্জ্বল লাল বর্ণ চকচকে এবং পাতলা মসৃণ ত্বক বেশি জনপ্রিয়। মরিচের ফুল ফোঁটা, ফল ধরা, রং ধারণ ইত্যাদি তাপমাত্রা, মাটির উর্বরতা এবং ভাল জাতের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ তাপমাত্রা বিরাজ করলে এর স্বাভাবিক উৎপাদন কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। মরিচ সাধারণত ৩-৮ পর্যায়ে তুলতে হয়। কাঁচা ফল বড় ও পুষ্ট দেখে তুলতে হয়। প্রতি সপ্তাহে পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। শুকনো মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রং ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। ফলগুলো সাধারণত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, ছায়াযুক্ত এবং শুকনো জায়গায় ২৮° সে. তাপমাত্রা ও ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করলে ১-২ সপ্তাহে কোন ক্ষতি হয় না।

শুকানো

পাকা মরিচ শক্ত মাটির উপরে বা পাকা মেঝে বা টিনের চালে অথবা পাকা বাড়ির ছাদে ৫-৮ সেমি পুরু করে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকানো হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি সূর্যের আলো মরিচে 'হোয়াইট প্যাচ' সৃষ্টি করে যা মরিচের গুণগত মান নষ্ট করে। সাধারণত ২২-২৫° সে. তাপমাত্রা মরিচ শুকানোর জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সব মরিচের রং সমভাবে ঠিক রেখে শুকানোর জন্য এবং যাতে মোল্ড/ছত্রাক জন্মাতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে রৌদ্রের মধ্যে মরিচ নেড়ে দিতে হবে। ভালভাবে না শুকালে মরিচের রং, ঝাঁঝ এবং চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ভাল বীজ, উচ্চ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, উজ্জ্বল রং, উন্নত পুষ্টিমান, অণুজীবের আক্রমণ এবং আফলাটক্সিন এর হাত হতে মরিচকে রক্ষার জন্য শুকনো মরিচের আর্দ্রতা ৮-১০% এর মধ্যে রাখতে হবে। শুকানোর সময় রোগে আক্রান্ত এবং রং নষ্ট হয়ে যাওয়া মরিচ বেছে ফেলে দিতে হবে। সাধারণত ১০০ কেজি কাঁচা মরিচ শুকিয়ে ২৫-৩৫ কেজি (১ কেজি পাকা মরিচ শুকালে ২৫০-৩০০ গ্রাম) শুকানো মরিচ পাওয়া যায়।

সোলার ড্রায়ার এর সাহায্যেও মরিচ শুকানো যায়। ৮ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হার্ড বোর্ড, কাঁচ ও তারের জাল দিয়ে ৩-৪ স্তর বিশিষ্ট সোলার ড্রায়ার তৈরি করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মরিচ শুকানো যায়। এতে মরিচের রং ভাল থাকে।

সংরক্ষণ

দূরবর্তী স্থানে কাঁচা মরিচ পরিবহণের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি এবং ছালার ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

দমন ব্যবস্থা

চারা লাগানোর পর ৫০ দিন পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বেশি ফলন পেতে হলে ১০০ দিন পর্যন্ত আগাছা দমন করা প্রয়োজন। চারা লাগানোর পর থেকে ১০০ দিন পর্যন্ত আগাছার ঘনত্বের ভিত্তিতে ৪ থেকে ৫ বার নিড়ানি দিতে হবে। প্রথম নিড়ানি চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন পর, দ্বিতীয় বার ৪০-৫০ দিন পর, তৃতীয় বার ৭০-৭৫ দিন পর এবং চতুর্থ বার ৯০-১০০ দিন পর দিতে হবে।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ১০-১২ টন কাঁচা মরিচ এবং ২.৫-৩ টন শুকনা মরিচ উৎপাদন হয়।

রসুন

রসুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কন্দ জাতীয় মসলা ফসল। এটি রান্নার স্বাদ, গন্ধ ও রুচি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। রসুন ব্যবহারে অজীর্ণ, পেটফাঁপা, ডিপথেরিয়া, বাতরোগ ও যে কোন রকম চর্মরোগ সারে। এছাড়া, রসুন থেকে তৈরি ঔষধ নানা রোগ, যেমন- ফুসফুসর রোগ, আন্ত্রিকরোগ, হুপিংকাশি, বাতরোগ, কানব্যথা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। রসুনে ৬২.০% পানি, ২৯.৮% কার্বোহাইড্রেট, ৬.৩% প্রোটিন, ০.১% তেল, ১.০% খনিজ পদার্থ ০.৪% আঁশ এবং ভিটামিন 'সি' আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে রসুনের মোট উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার মেট্রিক টন। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম। নিম্ন ফলনের মূল কারণ হল উচ্চ ফলনশীল জাতের অপ্রতুলতা। রসুনের জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র ১৯৯৬ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে।

রসুন ফসল

রসুনের জাত

বারি রসুন-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসুনের উচ্চ ফলনশীল জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০০৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক 'বারি রসুন-১' নামে জাতটি অনুমোদিত হয়।

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৬০-৬২ সেমি। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৭-৮টি, প্রতি কন্দে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২টি, কোয়ার দৈর্ঘ্য ২-২.৫ সেমি, কোয়ার ব্যাস ১-১.৫ সেমি, কন্দের ওজন প্রায় ১৯-২০ গ্রাম। কোয়া লাগানো থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ১৪০-১৫০ দিন সময় লাগে।

বারি রসুন-১

জাতটির ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। গড় ফলন ৬-৭ টন/হেক্টর।

বারি রসুন-২

রসুনের এ জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৫৬-৫৮ সেমি। প্রতি গাছের পাতার সংখ্যা ৯-১০টি, প্রতি কন্দে কোয়ার দৈর্ঘ্য ২.৫-৩ সেমি, কন্দের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সংরক্ষণ গুণ ভাল।

বারি রসুন-২

রোপণের সময় আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিকের শেষ। বীজের হার হেক্টরপ্রতি ৩০০-৪০০ কেজি (কোয়া)। ০.৭৫-১.০০ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। জীবন কাল ১২০-১৪০ দিন। তবে আবহাওয়াভেদে কোন কোন সময় কম বেশি হতে পারে। ফলন হেক্টরপ্রতি ৮-৯ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু

জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি রসুন চাষের জন্য উত্তম। মাটির অম্লতা pH ৬-৭ হলে সে মাটিতে রসুন ভাল হয়। তবে এঁটেল-দোআঁশ মাটিতেও চাষ করা যায়। রসুন খুব শীত বা বেশি গরম সহ্য করত পারে না। রসুন চাষের জন্য ঠাণ্ডা ও মৃদু জলবায়ু প্রয়োজন। রসুন গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন।

জমি তৈরি

৪-৫টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এ সময় জমিতে আগাছা থাকলে বেছে পরিষ্কার করতে হবে। জমি সমতল করে বেড তৈরি করতে হবে এবং এক বেড থেকে অন্য বেডের মাঝে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখা দরকার।

বিনা চাষে রসুন উৎপাদন

বন্যা প্লাবিত এলাকায় বন্যার পানি নেমে গেলে জমির আগাছা পরিষ্কার করে রসুনের কোয়া রোপণ করতে হবে। পরবর্তী সময়ে ধানের খড় দ্বারা মালচিং করে প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এভাবে বিনা চাষে রসুন উৎপাদন করা যায়।

রোপণ পদ্ধতি

মধ্য-অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রসুনের কোয়া লাগানোর উপযুক্ত সময়। এর পর রসুন লাগালে ফলন কম হয়। রো-কোদাল দিয়ে ২.৫-৩ সেমি গভীর নালা করে তার মধ্যে ১০ সেমি দূরে দূরে রসুনের কোয়া রোপণ করতে হবে। এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১০ সেমি।

বীজের আকার

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ০.৭৫-১.০০ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। তবে এর চেয়ে ছোট আকারের কোয়া রোপণ করলে ফলন হবে কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে না।

সার প্রয়োগ

ফলন বেশি পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার প্রয়োগে ফলন বেশি হয়। রসুনের জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	২১৭ কেজি
টিএসপি	২৬৭ কেজি
এম ও পি	৩৩৩ কজি
জিপসাম	১১০ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি জমি তৈরির সময় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমান ভাগে রসুন বপনের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর দিতে হবে। এছাড়া, জমিতে ছাই প্রয়োগ করলে মাটি আলগা থাকে এবং ফলন বেশি হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

রসুনের চারা বৃদ্ধির পর্যায় জমিতে আগাছা থাকলে পরিষ্কার করতে হবে। কন্দ গঠনের আগ পর্যন্ত ২-৩ বার নিড়ানি দিতে হবে। নিড়ানির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গাছের শিকড়ের কোন ক্ষতি না হয়। ৪-৫ সেমি পুরু করে কচুরিপানা বা ধানের খড় দ্বারা মালচ প্রয়োগ করলে রসুনের ফলন ভাল হয়। এই ক্ষেত্রে বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। মালচ ছাড়া চাষ করলে জমির প্রকারভেদে ১৫-২০ দিন পর সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগ ও পোকামাকড় দমন

রোগ বালাইয়ের মধ্যে ব্লাইট, সফট রট, ড্যাম্পিং অফ, ডাউনি মিলডিউ এবং পাতা ঝলসানো রোগ হয়। পাতা ঝলসানো রোগের ফলে পাতার উপর ছোট ছোট সাদাটে গোল দাগ দেখা যায়। এ রোগের ফলে পাতা প্রথমে হলদে ও পরে বাদমী রং ধারণ করে ঝরে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। এসব রোগ দমনের জন্য বর্দোমিক্সার (তুঁতেঃ চুনঃপানি = ১ঃ১ঃ১) বা ডাইথেন এম-৪৫/ রোভরাল ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর স্প্রে করে দমন করা যায়। অনেক সময় পটাশিয়ামের অভাবে রসুনের পাতার ডগা শুকিয়ে যায়।

এ অবস্থা দেখা দিলে প্রধান সার হিসেবে পটাশিয়াম দেওয়া ছাড়াও পরবর্তী সময় পটাশিয়াম সার দিলে ডগা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করা যায়। রসুন সাধারণত থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা, রেড স্পাইডার ও মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়। থ্রিপস পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতায় প্রথমে সাদা লম্বাটে দাগ দেখা যায় পরে পাতার অগ্রভাগ বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পাতা মরে নলের মত আকার ধারণ করে। এসব পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন/ডাইমেক্রন/জেসিড প্রতি লিটার পানিত ১ মিলি হারে স্প্রে করে সহজেই দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ

রসুন রোপণের ২ মাস পরে কন্দ গঠিত হতে থাকে। তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পর কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে। ৪-৫ মাস পরে রসুন উত্তোলন করা যায়। পাতার অগ্রভাগ হলদে বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে রসুন পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া, কন্দের বাহিরের দিকের কোয়াগুলি পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বিভাবে ফুলে উঠে এবং ২ কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। এ সময় রসুন তোলার উপযুক্ত হয়। গাছ হাত দিয়ে টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়। এরপর কন্দগুলি ৩-৪ দিন ছায়ায় রেখে শুকানোর পর গুদামজাত করা হয়।

গুদামজাতকরণ

শুকনো রসুন আলো বাতাস চলাচলযুক্ত ঘরের মাচায় বেনি করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে রসুন ভাল থাকে। এছাড়া হিমাগারে ০-২° সে. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-৭০% আর্দ্রতায় রসুন ভালভাবে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়।

হলুদ

মসলা হিসেবে হলুদ বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। মসলা ছাড়াও আচার-অনুষ্ঠানে ও ঔষধি গুণাগুণ হিসেবে হলুদের ব্যবহার ব্যাপক। বর্তমানে দেশে মোট চাহিদার তুলনায় হলুদের ঘাটতি রয়েছে। হলুদ উৎপাদনে বারি উদ্ভাবিত হলুদ জাতের চাষ এলাকা বাড়িয়ে হলুদের এ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বাংলাদেশে প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর জমিতে হলুদের চাষ হয় এবং উৎপাদন প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টন।

হলুদ ফসল

হলুদের জাত

বারি হলুদ-১ (ডিমলা)

স্থানীয় জাতের তুলনায় ডিমলার ফলন প্রায় ৩ গুণ। গাছের উচ্চতা প্রায় ১০৫-১২০ সেমি। বপনের ৩০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

হলুদের ছড়া চওড়া, হেক্টরপ্রতি ফলন ২৮-৩২ টন। প্রতি ৮ কেজি শুকনো হলুদ পেতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের প্রয়োজন হয় (১ঃ৫)। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি হলুদ-১

বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী)

স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন দ্বিগুণ। গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি। বপনের পর থেকে প্রায় ২৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়।

হলুদের ছড়ার আকার মাঝারী। শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। প্রতি ১০ কেজি শুকনো হলুদ তৈরিতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদ প্রয়োজন হয় (১:৪)। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি হলুদ-২

বারি হলুদ-৩

এ জাতটি ২০০৩ সালে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবমুক্ত হয়। এ জাতের গাছের উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১০-১২৫ সেমি। প্রতি গাছে মোথার ওজন প্রায় ১৫০-১৮০ গ্রাম এবং প্রতি গাছে হলুদের ওজন প্রায় ৭০০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। রং গাঢ় হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ শতকরা ১৪-১৫%।

বারি হলুদ-৩

বারি হলুদ-৪

গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি ও পাতার সংখ্যা ২২-২৮টি। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৩-৫টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৫টি (৫৫-৬০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২২-২৫টি (৪৫০-৫৫০ গ্রাম)। ফিংগার ৯.০-৯.৫ সেমি লম্বা এবং ২.৫-৩.০ সেমি চওড়া। রং (Core colour) কমলা হলুদ (Orange yellow)। শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকারা ২০-২২ ভাগ। লিফ স্পট ও লিফ ব্লচ রোগ সহনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ২৮-৩০ টন।

বারি হলুদ-৪

বারি হলুদ-৫

গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেমি ও পাতার সংখ্যা ২৪-৩০টি। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৪-৬টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২০-২২টি (২৫০-৩০০ গ্রাম)। ফিংগার ৯.০-১০ সেমি লম্বা এবং ২.০-২.৫ সেমি চওড়া। রং (Core colour) কমলা হলুদ (Deep orange yellow)। শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকারা ২৬-৩০ ভাগ। জাতটি লিফ স্পট ও লিফ ব্লচ রোগ সহনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ১৮-২০ টন।

বারি হলুদ-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি হলুদ চাষের জন্য উপযুক্ত। মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি

সারিতে বপন করা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি।

বপনের সময়

চৈত্র-বৈশাখ মাস (মধ্য-মার্চ থেকে এপ্রিল)।

বীজের হার

১.৮-২ টন/হেক্টর।

সারের পরিমাণ

হলুদ চাষের জন্য নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০৪ কেজি
টিএসপি	২৬৭ কেজি
এমওপি	২৩৩ কেজি
গোবর	৫ টন

সার প্রয়োগ

জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর এবং টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি কন্দ লাগানোর যথাক্রমে ৫০, ৮০ এবং ১১০ দিন পর সমানভাবে ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। হলুদ রোপণের পর খড় বা কচুরীপানা দিয়ে মালচিং করলে হলুদ ভাল গজায়। মাটি শুষ্ক হলে বীজ রোপণের পর পরই সেচ দিতে হবে।

জীবন কাল

২৭০-৩০০ দিন।

ফলন

২০-২৫ টন/হেক্টর।

ধনিয়া

ধনিয়া বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় মসলা ও পাতা জাতীয় সবজি। ধনিয়া পাতা ভিটামিন 'এ' এবং 'ক্যারোটিন' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে ধনিয়া চাষ করা হয় এবং উৎপাদান প্রায় ৪০ হাজার টন। মসলা ছাড়াও ধনিয়ার চারা গাছে পাতা সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনিয়া মসলা হলেও এতে অনেক ভিটামিন রয়েছে। বাংলাদেশে ধনিয়ার চাষ বাড়িয়ে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে।

ধনিয়ার জাত

বারি ধনিয়া-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। পাতা সবজি ও বীজ ফসল হিসেবে 'বারি ধনিয়া-১' উৎপাদন করা যায়।

পাতা বহু বিভক্ত, ফুল সাদা ও যৌগিক আম্বেল। গাছের উচ্চতা ৫৬-৯০ সেমি। পাতার আকৃতি বড় ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৬-১৮টি। বীজ ডিম্বাকার হলদে। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি বীজ হয়।

পাতা ফসল ৩০-৩৫ দিনে এবং বীজ ফসল ১১০-১২০ দিনে সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরপ্রতি পাতার ফলন ৩.৫-৪ টন এবং বীজের ফলন ১.৭-২ টন।

বারি ধনিয়া-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

প্রায় সব রকমের মাটিতেই ধনিয়া চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। ধনিয়া আবাদের জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বপনের সময়

মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর মাস)।

জমি তৈরি

মাটির প্রকারভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।

বীজ বপন

বীজ বোনার আগে পানিতে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। সারি বা বেড পদ্ধতিতে বীজ বপনের জন্য হেক্টরপ্রতি ১০-১২ কেজি বীজ লাগবে। বীজ ছিটিয়ে বোনা হলে হেক্টরপ্রতি দ্বিগুণ বীজ ব্যবহার করতে হবে। ধনিয়া মিশ্র ফসল হিসেবে সারি পদ্ধতিতে বপনের জন্য ৪-৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে।

সার প্রয়োগ

ধনিয়া চাষের জন্য নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১৫০-১৮০ কেজি
টিএসপি	১১০-১৩০ কেজি
এম ও পি	৯০-১১০ কেজি

জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি সার ২ কিস্তিতে বীজ বপনের যথাক্রমে ২৫ এবং ৪০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

পাতা ফসলের জন্য চারা গাজানোর ১০-১৫ দিন পর প্রতি সারিতে ৫ সেমি পর পর একটি চারা রেখে বাকিগুলো তুলতে হবে। বীজ ফসলের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ সেমি পরপর একটি চারা রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি ঝুরঝুরা করে দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর জমির 'জো' আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। ধনিয়ার জমিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ধনিয়া ফসল

বিলাতি ধনিয়া

বিলাতি ধনিয়া বা বাংলা ধনিয়া বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক এ পাতা জাতীয় ফসলটির উচ্চ পুষ্টিমান, প্রখর সুগন্ধিযুক্ত এবং উন্নত ভেষজ গুণের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এর চাষাবাদ ও বিস্তৃতি দ্রুত বাড়ছে। ১৯৯৯ সালে সারা বিশ্বে এর মোট উৎপাদন ৯ হাজার টন থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ১০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। বিলাতি ধনিয়া বর্তমানে অধিকাংশ কিচেন গার্ডেনের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

বারি বিলাতি ধনিয়া -১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনাস্টটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র ২০১৩ সালে 'বারি বিলাতি ধনিয়া-১' নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছে। এর পাতা আকর্ষণীয় সবুজ রঙের সুগন্ধিযুক্ত, সুস্বাদু, উচ্চতর পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ। এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষ উপযোগী ও উচ্চ ফলনশীল (প্রতি হেক্টরে পাতা ৩০-৫০ টন এবং বীজের ফলন ৩০০-৪০০ কেজি)।

বারি বিলাতি ধনিয়া -১

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি

বিলাতি ধনিয়া প্রধানত খরিফ মৌসুমের ফসল। নাতিশীতোষ্ণ থেকে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। অত্যধিক শীতল আবহাওয়ায় এর বৃদ্ধি কমে যায়। প্রখর সুর্যালোকের চেয়ে ছায়াতে বা হালকা বিক্ষেপিত (৫০-৭৫%) আলোতে ভাল পাতা উৎপাদন করে।

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বিলাতি ধনিয়া জন্মে। এ ধনিয়া চাষের জন্য প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশিত দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি বেশি উপযোগী। ভাল ফলনের জন্য মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন অথচ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। এ জন্য প্লাবন সেচের চেয়ে ঝরনা সেচ এ ধনিয়া চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি তৈরি

বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য ৫/৬ টি চাষ ও উপর্যুপরি মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরা করা প্রয়োজন। বিলাতি ধনিয়ার বীজ খুবই খুদ্রাকৃতির (বালির দানার মত ছোট) হওয়ায় বড় আকারের ঢেলার মধ্য দিয়ে তাদের গজানো সম্ভব নয়। বীজ বপনের পূর্বে মাটিতে প্রয়োজনীয় রস ('জো' অবস্থা) থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে বপন পূর্ব সেচ দিয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অধিকাংশ মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকে। এক মিটার চওড়া বেড এবং ৩০ সেমি চওড়া নালা রাখা প্রয়োজন। এ নালার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যা, পানি সেচ ও নিকাশের কাজ সহজ হয়।

বপন সময়

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি (মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-ফাল্গুন) মাস বিলাতি ধনিয়ার বীজ বপনের উত্তম সময়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে মার্চ মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। তবে বীজ বপনের পরেও অন্তত ২০-২৫ দিন কম তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন। বিলাতি ধনিয়া বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১২-২০° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর গজানোর হার কমে আসে।

বীজ শোধন

বিলাতি ধনিয়ার বীজে সাধারণ অবস্থায় ২/৩ মাসের বেশি অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে না। এজন্য বীজ সংগ্রহের পর যত শীঘ্র সম্ভব হালকাভাবে ছায়াতে শুকিয়ে বপন করা উচিত। সাধারণভাবে (শোধন ছাড়া) প্রতি হেক্টরে ৪০ কেজি হারে বা প্রতি বর্গমিটারে ৪ (চার) গ্রাম অর্থাৎ প্রতি শতাংশ জমিতে ১৬০ গ্রাম বীজ বপন করে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। এতে প্রতিকেজি ৫০০০/- টাকা হারে হেক্টরে দুই লক্ষ টাকার বীজের প্রয়োজন হয়। তবে বীজ ৭২-৯৬ ঘন্টা প্রাইমিং করে (৮ ঘন্টা ভিজিয়ে পরে চার ঘন্টা ছায়াতে শুকিয়ে এভাবে ৬-৮ বার) GA_3 ১০০০ পিপিএম এবং কাইনেটিন (৫০ পিপিএম) নামক হরমোন মিশ্রণে বীজ এক ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপর পানি ঝরিয়ে হালকা শুকিয়ে বপন করলে এর এক চতুর্থাংশ বীজই যথেষ্ট। অঙ্কুরোদগম হার চারগুণ হওয়ায় বীজহার কমে আসে। এতে প্রতি হেক্টরে ১৫০০/- টাকার হরমোন প্রয়োজন হলেও বীজের খরচ প্রায় ১,৫০,০০০/- টাকা কমে যায়। আর অল্প বীজে বেশি জমিতে আবাদ করে কৃষক বেশি লাভবান হতে পারে।

বীজ বপন

বিলাতি ধনিয়ার ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ সমানভাবে বোনা বেশ কষ্টকর এবং দক্ষতারও প্রয়োজন। তাই বালির সাথে মিশিয়ে বীজ বোনা ভাল। ১০ সেমি দূরত্বে সারিতে অথবা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়।

ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজ বপনের পর মাটি উপরের স্তরের (০.৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত) সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সারিতে বপন করলে ১.০-১.৫ সেমি গভীর নালা করে নালাতে/সারিতে বীজ ছিটিয়ে দুই পাশের মাটি দিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে। এর সব বীজ এক সাথে গজায় না। একই দিনে বোনা বীজ গজাতে ১৫ থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত সময় নেয়। ফলে এক বার বীজ বপন করেও কৃষক অনেক বার (৪-৮ বার) ফসল উত্তোলন করতে পারে।

সার প্রয়োগ

পাতা জাতীয় ফসল হওয়ায় বিলাতি ধনিয়ার জন্য ইউরিয়া ও পটাশ জাতীয় সার বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বীজ বপনের পূর্বে শতাংশপ্রতি ৮০ কেজি পচা গোবর বা আবর্জনা পচা সার (কম্পোস্ট) ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৮০০ গ্রাম টিএসপি ও ৮০০-১০০০ গ্রাম এমপি শেষ চাষের সময় বীজ বপনের ৪/৫ দিন পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিন পর থেকে ১ মাস অন্তর অথবা ফসল সংগ্রহের পর প্রতি

শতাংশে ২০০ গ্রাম হারে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের পরপরই হালকা ঝরনা সেচ দিতে হবে। এভাবে প্রতি হেক্টর জমিতে মোট ২০ টন কম্পোস্ট, ৩৫০ কেজি ইউরিয়া, ২০০ কেজি টিএসপি এবং ২৫০ কেজি এমওপি (পটাশ) সারের প্রয়োজন হবে।

ছাউনী প্রদান

বিলাতি ধনিয়ার পাতা নরম, চওড়া ও মসৃণ হওয়ার জন্য জমিতে ছাউনী দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রখর সূর্যালোকে পাতা শক্ত ও কাঁটাযুক্ত হয়ে যায় এবং দ্রুত ফুল উৎপাদনের ফলে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়। আবার সম্পূর্ণ আলোক বিবর্জিত হলেও ফলন ভাল হয় না। মাচায় ব্যবহৃত ছাউনীর দ্রব্যের ওপর বিলাতি ধনিয়ার ফলন নির্ভর করে না। শুধুমাত্র ছাউনীর ঘনত্বের বা আলো প্রতিরোধ মাত্রার ওপর এর গুণাগুণ ও ফলন নির্ভর করে। মোট সূর্যালোকের শতকরা ৫০-৬০ ভাগ আলো প্রাপ্তির জন্য বাশের খুঁটিতে জি আই তারের সাহায্যে টাঙ্গানো রঙিন নাইলন মশারির ছাউনী সবচেয়ে ভাল প্রমাণিত হয়েছে। তবে বাঁশের তৈরি মাচায় নারিকেল পাতা, ছন, ধৈঞ্চা, কলাপাতা দ্বারা ছাউনি তৈরি করা যেতে পারে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয় ও লাভ বেশি হবে। আবার হালকা মাচার উপর কুমড়া জাতীয় গাছ তুলে দিয়ে তা থেকে বেশ কিছু বাড়তি ফলন পাওয়া যেতে পারে। মাচার পার্শ্ব দিয়ে সরাসরি যাতে সূর্যালোক না পড়ে সেজন্য পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছাউনীর মত ঘনত্বের বেড়া দেওয়া প্রয়োজন।

সেচ ও নিকাশ

বিলাতি ধনিয়ার জন্য সব সময় পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে আবার গাছের গোড়ায় পানি জমতে দেওয়া যাবে না। এজন্য ঝরনা পদ্ধতিতে মাটির অবস্থা বুঝে (৪-৭ দিন পরপর) হালকা সেচ দেওয়া ভাল। বেডের পাশের নালা দিয়ে বৃষ্টির সময়ে অতিরিক্ত পানি বের করে দেওয়ায় সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বিলাতি ধনিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু আগাছা। বীজ বপনের পরে চারা গজানোর পূর্ব থেকে ফসল তোলার শেষ পর্যায় পর্যন্ত জমিকে সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সাধারণত ৪ মাস বয়স থেকে বিলাতি ধনিয়ার গাছে ফুল আসা শুরু হয়। বিলাতি ধনিয়ার গাছের পুষ্পদণ্ড দেখা দিলে তা গোড়া থেকে ভেঙ্গে দিতে হবে। অন্যথায় পাতা উৎপাদন ব্যহত হয় এবং ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। তবে জুন-আগস্ট মাসে গাছ পাতলা করে রেখে দিলে পরবর্তী বৎসরের জন্য বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

রোগবালাই

বিলাতি ধনিয়ার চাহিদা, বাজার ও চাষাবাদ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বেশ কয়েকটি মারাত্মক রোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকার কৃষকগণ এসব রোগের কারণে বিলাতি ধনিয়া চাষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ড্যাম্পিং অফ

বিলাতি ধনিয়া চাষের ক্ষেত্রে এ রোগটি সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং মারাত্মক। এ রোগের আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণ: চারা অবস্থায় এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। গাছ ছোট থাকা অবস্থায় এক এক স্থানে হঠাৎ করে কচি চারাগাছ মারা যাওয়া শুরু করে এবং তা ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্লটের সব গাছ মারা যায়। অনেকটা নার্সারীতে ড্যাম্পিং অফ রোগের মতই এ রোগের লক্ষণ।

রোগের কারণ: বেশ কয়েক ধরনের ছত্রাক প্রজাতি, যেমন- *Pythium, Phytopthera, Sclerotium, Fusarium* ইত্যাদি ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রা, অধিক আর্দ্রতা ও বেশি ভিজা মাটিতে এ রোগ বেশি হয়। জমির নালাতে বা প্লটে পানি জমে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেলে এ রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। পূর্ববর্তী বছরের রোগাক্রান্ত মাটি থেকেও এ রোগ হতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা: গোড়ায় পানি জমলে বা মাটি বেশি স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেলে কচি চারা গাছের ক্ষেত্রে গোড়া পচা অথবা ড্যাম্পিং অফ রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে রোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১. সুনিষ্কাশিত জমিতে আবাদ এবং প্লটগুলি উঁচু করে ভালভাবে পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখা ।

২. শস্য পর্যায় অবলম্বন বা একই জমিতে বারবার বিলাতি ধনিয়ার চাষ না করা।

৩. রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ এবং চাষের পূর্বে জমির আগাছা বা অন্যান্য আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা।

৪. বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১ লিটার হারে ১% ফরমালিন (প্রতি লিটার এ ১০ মিলি) দ্রবণ দ্বারা মাটি শোধন করে পলিথিন দ্বারা ৭ দিন ঢেকে রেখে তারপর ৩ দিন আলাগা রেখে বীজ বপন করা। এতে মাটিস্থ ছত্রাক মারা যাওয়ায় রোগের প্রকোপ কম হবে।

৫. আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে নোইন (Knowin) নামক ছত্রাকনাশক ০.২৫% হারে ভালভাবে গাছ ও গাছের গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে ৭ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে মোটামুটিভাবে এ রোগ দমন করা যায়।

লিফ স্পট বা পাতা পোড়া দাগ রোগ

এ রোগটির ব্যাপকতা অন্য দুইটি রোগের চেয়ে বেশি এবং এতে ফসলের গুণাগুণ ও ব্যবহারযোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে। পাতায় দাগ ও ঝলসে যাওয়ার কারণে ধনিয়া পাতা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং ফলন অনেক কমে যায়।

রোগের লক্ষণ: প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট পানি ভেজা দাগের মত স্পট দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা খড়ের বর্ণ ধারণ করে এবং চতুর্দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দাগের মাঝে লক্ষ করলে এক ধরনের রিং পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে দাগের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পেয়ে পুরো পাতাটাই ঝলসে যায়।

রোগের কারণ: প্রাথমিকভাবে *Alternaria* sp. নামক এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ থেকে এবং অন্যান্য পোষক থেকেও এ রোগ আসতে পারে।

প্রতিকার

১. রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা।

২. রোভরাল (Rovral) নামক ছত্রাকনাশক ০.৩% মাত্রায় (প্রতি লিটারে ৩ গ্রাম) ভালভাবে পাতা ও গাছ ভিজিয়ে ৭ দিন অন্তর ২/৩ টি স্প্রে দ্বারা এ রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্পট এবং উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ

ইদানিং ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগটি ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে। এ রোগের ফলে পাতা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে ও বাজার মূল্য কমে যায়। বয়স্ক গাছে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এ রোগের কারণে বীজ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বীজ উৎপাদনের জন্য জমিতে গাছ রেখে দিলে ২/৪ দিন পর পর দুই-একটি করে গাছ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ গাছের পাতায় প্রান্ত থেকে প্রথমে বাদামী বা কালচে বাদামী দাগ পড়ে। এ দাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো গাছটিই এক সময় মরে যায়। পুষ্পমঞ্জরী বের হওয়ার পর এ রোগ বেশি দেখা যায়।

রোগের কারণঃ বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক এবং *Erwinia eryngii* নামক ব্যাকটেরিয়া এর সমন্বয়ে এ রোগ হয়ে থাকে। এ ব্যাকটেরিয়াটি মাটিতে ও বীজে অবস্থান করে । উষ্ণ তাপমাত্রা, স্যাঁতসেঁতে মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগের উপযোগী। ফসলের জমিতে বা নালাতে পানি জমে মাটি বেশি ভেজা থাকলে ও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার

দ্বিগুণ মাত্রায় (১মিলি লিটার পানিতে) টিল্ট নামক ছত্রাকনাশক ব্যবহারে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। ১০০০ পিপিএম টেট্রাসাইক্লিন ও ০.২% কপার অক্সিক্লোরাইড ১০ দিন অন্তর প্রয়োগেও সুফল পাওয়া গেছে। ভারতের কৃষির জন্য স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন (স্ট্রেপ্টোমাইসিন + টেট্রাসাইক্লিন) এর বাণিজ্যিক ফরমুলেশনে এ রোগের জন্য কার্যকরী হতে পারে। তবে এটা আমাদের দেশে সুলভ নয়। পাতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রোগ আক্রমণের আগেই সংগ্রহ করা ভাল। তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত গবেষণা চলছে।

ফসল সংগ্রহ

সাধারণত বিলাতি ধনিয়ার সম্পূর্ণ গাছটাই তুলে সংগ্রহ করা হয়। ১৫-২৫ সেমি এর মত (পাতাসহ) লম্বা গাছগুলি তুলে নেওয়া হয়। এভাবে বড় চারাগুলি তুলে নেয়ার পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ ও আগাছা বাছাই করার পর অবশিষ্ট গাছগুলি বড় হতে থাকে এবং ১৫-২০ দিনের মধ্য পুনরায় আহরণযোগ্য আকার প্রাপ্ত হয়। এভাবে ৪-৮ বারে প্রতি হেক্টর জমি থেকে সর্বমোট ৩০ থেকে ৫০ টন (প্রতি শতাংশে ১২০-২০০ কেজি) পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। তবে কিচেন গার্ডেন বা পটে লাগানো গাছ থেকে গৃহিণীরা সরাসরি পাতা তুলেও ব্যবহার করতে পারেন। এভাবে এক বার রোপণ করা গাছ থেকে বহুদিন পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায়।

গোল মরিচ

গোল মরিচ বহুবর্ষজীবী লতা জাতীয় গাছ। চির সবুজ পাতা অনেকটা পানের মত। গোল মরিচ গাছের আপন আকর্ষি দিয়ে সহায়ক গাছকে আকড়িয়ে থাকে। ইহা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের চির হরিৎ বনভূমির একটি দেশীয় গাছ।

গোল মরিচের জাত

জৈন্তিয়া গোল মরিচ

জৈন্তিয়া গোল মরিচ জাতটি মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা থেকে আনা বিভিন্ন জাত থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হয়।

এ জাতটি ভাল বাওনী পেলে ১০-১১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। স্বাদ ঝাল, দানা পুষ্ট ও বড় আকৃতির। গাছপ্রতি ফলন ১.২৫-১.৫০ কেজি শুকনা গোল মরিচ।

জৈন্তিয়া গোল মরিচ

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদন

কেবল অযৌন পদ্ধতিতে গোল মরিচের বংশ বিস্তার হয়। সেন্ট্রাল সিডার যা প্রধান গাছের গোড়া থেকে গজায় এমন লতা থেকে চারা (কাটিং) সংগ্রহ করাই উত্তম। কমপক্ষে ৩-৪টি গিঁটসহ ৩০-৪৫ সেমি লম্বা শাখা কাটিং হিসেবে নিতে হবে। কাটিংগুলো সরাসরি সহায়ক গাছের গোড়ায় লাগানো যেতে পারে এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। বীজতলায় কাটিং লাগালে ২০-৩০ দিনের মধ্যে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুরু করে। এক বছর বয়সের কাটিং বাগানে লাগানো উত্তম।

জমি তৈরি

গোল মরিচের জন্য পাহাড়ী উর্বর দোআঁশ মাটি প্রয়োজন এবং দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চারা রোপণ

মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে প্রত্যেক সহায়ক বৃক্ষের পাশে তৈরি গর্তে ২-৩টি কাটিং লাগাতে হবে এরপর পানি দিতে হবে। কাটিংগুলি সহায়ক বৃক্ষের উত্তর পার্শ্বে লাগানো হলে সূর্যের তাপ কম লাগবে। সূর্য তাপ হতে প্রাথমিকভাবে রক্ষার জন্য পাতাওয়ালা গাছের ডাল বা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জংলী যে কোন বৃক্ষ বা ফলের গাছ (কাঁঠাল, লটকন ইত্যাদি ছাড়া অর্থাৎ যে সব গাছে গোড়া ও প্রাথমিক বড় শাখাতে ফল ধরে) সহায়ক বৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি

গর্তের আকার ৫০ × ৫০ × ৫০ সেমি।

সারের পরিমাণ

গাছের বৃদ্ধি এবং ভাল ফলন পেতে হলে সময়মত প্রয়োজনীয় সার উল্লিখিত হারে প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণের সময় সারের পরিমাণ

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ	গাছপ্রতি সার প্রয়োগ	
		প্রথম বার (বর্ষার শুরুতে)	দ্বিতীয় বার (বর্ষার শেষে)
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	১০	-	-
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	৫০	৫০
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	-	৫০	৫০

বয়স অনুযায়ী গাছপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় নিচে দেয়া হলঃ

সারের নাম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	-	৫	-	৫
টিএসপি (গ্রাম)	-	২৫০	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	৫০	৫০	৫০	৫০

সার প্রয়োগ

প্রথমবার সার প্রয়োগ করতে হবে বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা বৈশাখ মাসে (মধ্য-এপ্রিল থেকে মধ্য-মে) এবং ২য় বার বর্ষার শেষে অর্থাৎ আশ্বিন (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) গর্তগুলি ১০-১২ দিন খোলা রাখার পর প্রতি গর্তে ১০ কেজি পচা গোবর ও ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে পূর্ণ করে রাখতে হবে।

পানি সেচ

রোপণের সময় মাটি শুকনো থাকলে সেচ দিতে হবে। খরা মৌসুমে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে সব সময়ে রস থাকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি ছিদ্রযুক্ত কলসি অথবা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পানি ভর্তি করে সহায়ক গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ছিদ্র দিয়ে সারাক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকলে গাছের বৃদ্ধি

এবং ফলের জন্য সবচেয়ে উপকারী। অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সেজন্য নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাঁটাইকরণ

গোল মরিচ গাছের শাখা-প্রশাখা বেড়ে অতিরিক্ত ঝোপ হয়ে গেলে তা সামান্য পরিমাণে ছেঁটে পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম পাঁচ বছর গোল মরিচ গাছের তেমন কোন ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে ফসল সংগ্রহের সুবিধার জন্য লতার আগা কেটে দেয়া যেতে পারে। এতে পার্শ্ব শাখাগুলো মজবুত এবং অধিক ফল দেয়। বর্ষা মৌসুমে গোল মরিচ গাছ যেন প্রচুর আলো-বাতাস পায় সেজন্য প্রয়োজনমত সহায়ক গাছ বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ছেঁটে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

লতা রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফসল ধরা শুরু হয়। একটি গাছ পূর্ণ উৎপাদনের অবস্থায় আসে ৭-৮ বছর বয়সে এবং ২০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলন দেয়। গোল মরিচ গাছে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথমার্ধে ফুল আসে। ১০-১৫ সেমি লম্বা গুচ্ছে খুব ছোট হলুদ ফুল ফোটে যা পরবর্তী সময়ে পাকা বেরিতে (ফল) রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর (মধ্য-অগ্রহায়ণ থেকে মধ্য-পৌষ) মাসের শেষ ভাগে যখন ২-১টি ফল লাল হয় তখনই সম্পূর্ণ গুচ্ছটি কেটে নিত হয়।

পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ গড়ে ২.৫-৩ কেজি কাঁচা গোল মরিচ ফলন দেয় যা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শুকানোর পর গড়ে ১.২৫-১.৫০কেজি হয়।

ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ

সংগ্রহের পর ফলগুলো গুচ্ছ থেকে আলাদা করে একটি পাত্রে জমা করতে হবে। তারপর দানাগুলো ফুটন্ত পানিতে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরা দিয়ে ফলগুলো রোদে শুকাতে হবে। যে পানিতে দানাগুলো সিদ্ধ করা হয়েছে সেই পানি কিছুক্ষণ পর পর দানাগুলোর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে শুকনা গোল মরিচের রং সুন্দর হয়, সুগন্ধ অটুট থাকে এবং ঝাল নষ্ট হয় না। এভাবে ৬-৭ দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বাজারজাত করা যায়।

আদা

আদা আমাদের দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় মসলা ফসল। দেশে উৎপন্ন আদা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রতি বছর প্রয়োজনীয় আদার একটা বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু মানসম্পন্ন আদার চাষাবাদ বাড়লে দেশের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। সে লক্ষ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র নানা রকমের গবেষণা করে আদার একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি আদা-১

জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৮০ সেমি। প্রতি গোছায় পাতার সংখ্যা ২১-২৫টি এবং পাতাগুলি আংশিক খাড়া প্রাকৃতির। প্রতি গোছায় টিলারের সংখ্যা ১০-১২টি। প্রতিটি গোছায় রাইজোমের ওজন ৪০০-৪৫০ গ্রাম। প্রচলিত জাতগুলির চেয়ে এর ফলন তুলনামূলকভাবে বেশি। স্থানীয় জাতের মত বারি আদা-১ সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

বারি আদা-১

চাষাবাদের উপযোগিতা

বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই আদার এ জাতটি চাষ করা সম্ভব। তবে বগুড়া, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি জেলায় অন্যান্য জাতের পাশাপাশি এ জাতটি ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা যেতে পারে।

রোপণের সময়

এপ্রিলের শুরু থেকে মে মাস পর্যন্ত আদা রোপণ করা যায়। তবে এপ্রিলের শুরুতে রোপণকৃত আদার ফলন সবচেয়ে বেশি হয়।

বীজের হার

আদার ফলন অনেকাংশে বীজের আকারের ওপর নির্ভর করে। বীজ আদার আকার বড় হলে ফলন বেশি হয়। ৩৫-৪০ গ্রাম আকারের বীজ রোপণ করলে আদার ফলন বেশি পাওয়া যায়। তবে খরচের কথা বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে ছোট (২০-৩০ গ্রাম) আকারের বীজ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ আকারের বীজ রোপণ করলে হেক্টরপ্রতি ১.৬-২.৪ টন আদার প্রয়োজন হয়।

জীবন কাল

প্রায় ৯-১০ মাস। তবে বীজের ক্ষেত্রে আদার গাছ আরও অধিক সময় মাঠে রাখা উত্তম।

ফলন

হেক্টরপ্রতি প্রায় ২০-২৫ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া

আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া দরকার। আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে আদা ভাল হয়।

মাটি

উর্বর দোআঁশ মাটি আদা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে এঁটেল মাটিতে চাষ করলে পানি নিষ্কাশনের খুব ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে।

জমি তৈরি

মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর জমি যখন 'জো' অবস্থায় আসে তখন ৬-৮টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। এরপর ৪ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ২ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট বেডের চারিদিকে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ৫০ সেমি চওড়া নালা তৈরি করতে হবে।

বীজ শোধন

৭৫-৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে এর মধ্যে ১০০ কেজি বীজ আদা ৩০ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করতে হয়। এ বীজ আদা ছায়াযুক্ত স্থানে খড়/চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ভ্রূণ বের হয়। এ ভ্রূণযুক্ত আদা জমিতে রোপণ করতে হয়।

বীজ রোপণ

দুই সারি এবং একক সারি পদ্ধতিতে আদা রোপণ করা হয়। দুই সারি পদ্ধতিতে প্রতি বেডে সারি থেকে সারি ৫০ সেমি এবং কন্দ থেকে কন্দ ২৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। একক সারি পদ্ধতিতে ৫০ সেমি পরপর ৫-৬ সেমি গভীর করে সারি তৈরি করার পর ২৫ সেমি দূরত্বে বীজ আদা রোপণ করতে হয়। বীজ আদা রোপণের সময় সবগুলো বীজের অঙ্কুরিত মুখ একদিকে রাখতে হয় যাতে বীজ আদা রোপণের ৭৫-৯০ দিন পর সারির এক পার্শ্বের মাটি সরিয়ে সহজেই পিলাই সংগ্রহ

(আদার রাইজোম) করা যায়। এভাবে পিলাই আদা সংগ্রহ করলে খরচের ৬০-৭০ ভাগ আগাম উঠে আসে।

সার প্রয়োগ

কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের ওপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। বেশি ফলন পেতে হলে আদার জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। আদার জন্য প্রতি হেক্টরে জৈব ও রাসায়নিক সার নিচে উল্লিখিত হারে প্রয়োগ করতে হবে:

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	৩০০ কেজি
টিএসপি	২৭০ কেজি
এম ও পি	২৩০ কেজি
জিঙ্ক	৩ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর এবং টিএসপি, জিপসাম, জিঙ্ক এবং অর্ধেক এমপি জমি তৈরির সময় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া এবং এমওপি সারের অর্ধেক আদা রোপণের ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া এবং এমওপি দুই কিস্তিতে সমানভাবে বীজ রোপণের ৮০ দিন এবং ১০০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

রোপণের ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে আদার গাছ বের হয়। আদা রোপণের ৫-৬ সপ্তাহ পর জমির আগাছা নিড়িয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজনমত আগাছা পুণরায় পরিষ্কার করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। আদার রাইজমের বৃদ্ধি এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ২-৩ বারে সারির মাঝখানে থেকে মাটি তুলে আদা গাছের গোড়ায় দিতে হবে। অনেক সময় আদা রোপণের পর পাতা/ধানের খড় দিয়ে জমি মালচিং করা হয়। আদার জমিতে ছায়া প্রদানকারী গাছ যেমন- ধইঞ্চা, বকফুল

ইত্যাদি বীজ লাগানো যায়। এ সমস্ত গাছ ১.৫-২.৫ মিটার উঁচু হলে আগা কেটে দিয়ে শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও আদার জমিতে মাচার লাউ, পটল, শিম,বরবটি ইত্যাদি ছায়ার গাছ হিসেবে আবাদ করে বাড়তি আয় উপার্জন সম্ভব।

রোগ ও পোকামাকড়

রাইজোম রট

এ রোগের আক্রমণে আদার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। জমিতে এ রোগ দেখা দিলে প্রথমে গাছের কাণ্ড হলুদ হয়ে যায় এবং পরে রাইজোম পচে সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা

- একই জমিতে বার বার আদা চাষ করা যাবে না।
- রাইজাম রট থেকে রক্ষা করার জন্য আদা লাগানোর পূর্বে জমিতে ধানের/কাঠের গুঁড়া ও খড় দিয়ে আগুন লাগিয়ে জমিকে শোধন করতে হবে।
- নিমের খৈল ২ টন/হেক্টর প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ দ্রুত জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

পাতা ঝলসানো রোগ

প্রাথমিক অবস্থায় পাতায় ফ্যাকাশে হলুদ বর্ণের ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। এসব দাগগুলোর মধ্যে ধূসর বর্ণ হয় এবং চারপাশে গাঢ় বাদামী আবরণ থাকে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে দাগগুলো বড় হতে থাকে এবং একত্রিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় পাতা আগাম ঝলসানো বলে মনে হয়। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ২-৩ বার ১৫ দিন পরপর স্প্রে করা যেতে পারে।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

আদা ফসলে মাঝে মাঝে কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে ডাইমেক্রন অথবা ডারসবান প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ

কন্দ রোপণের প্রায় ১০-১১ মাস পর পাতা এবং গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কোদাল দিয়ে মাটি আলাদা করে আদা উত্তোলন করা হয়। ফসল সংগ্রহের পর মাটি পরিষ্কার করে আদা সংরক্ষণ করা হয়।

সংরক্ষণ

আদা উঠানোর পর ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের মেঝেতে গর্ত করে গর্তের নিচে বালির ২ ইঞ্চি পুরু স্তর করে তার উপর আদা রাখার পর বালি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পরে খড় বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এতে আদার গুণাগুণ এবং ওজন ভাল থাকে।

কালজিরা

দেশে মসলা ফসলের মধ্যে কালজিরার ব্যবহার কম। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক থেকে গৌণ হলেও কালজিরা জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মসলা। কনফেকশনারী ও রন্ধনশালায় দৈনন্দিন বিভিন্ন খাদ্য তৈরিতে এর জুড়ি নেই। কালজিরার ঔষধি গুণাবলীও কম নয়। পেট ফাপা, চামড়ার ফুস্কুরী, মায়েদের প্রসব ব্যথা, ব্রঙ্কাইটিস, এজমা ও কফ দুর করতে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরীরের মূত্রবর্ধক ও উদ্দীপক হিসেবে কালজিরা ব্যবহৃত হয়। এদেশে অল্প জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে কালজিরার চাষ হয়ে থাকে। ফসলটির উন্নয়নের প্রধান বাধা হল এর উন্নত জাত ও উৎপাদন কৌশলের অভাব। বর্তমানে দেশে ব্যাপক চাহিদার কারণে কালজিরা চাষ একান্ড় প্রয়োজন।

বারি কালজিরা-১

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতিটি গাছে প্রায় ৫-৭টি প্রাথমিক শাখা এবং ২০-২৫টি ফল থাকে। প্রতিটি ফলের ভিতরে প্রায় ৭৫-৮০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ০.২০-০.২৭ গ্রাম। প্রতি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩-৩.২৫ গ্রাম। বীজ পরিপক্ক হতে ১৩৫-১৪৫ দিন সময় লাগে। বীজের হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১ টন। স্থানীয় জাতের তুলনায় এর রোগবালাই খুব কম।

বারি কালজিরা-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

জলাবদ্ধতা মুক্ত উঁচু ও মাঝারী উঁচু এমন জমিতে কালজিরা চাষ করা হয়ে থাকে। দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটিতে এটি চাষের জন্য উত্তম। জমিতে পানি সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা ভাল। শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কালজিরা চাষের বেশি উপযোগী। মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ রোগবালাইয়ের বিস্তারে অনুকূল। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি হলে কালজিরার ফলন কমে যায়।

জমি তৈরি

সাধারণত ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে এবং আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করা হয়।

বীজ বপন

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা হয়। তবে নভেম্বর মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহ বীজ বপনের উত্তম সময়।

বীজের পরিমাণ

বীজ ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টরপ্রতি ৬-৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সারি করে বীজ বপন করলে (১৫ × ১০ সেমি দূরত্বে) হেক্টরপ্রতি ৩.৫-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ জমিতেই জৈব সারের ঘাটতি রয়েছে। তাই সম্ভব হলে জৈব সার বেশি পরিমাণে দেওয়াই ভাল। নিচে হেক্টরপ্রতি জৈব ও অজৈব সারের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

সারের নাম	পরিমাণ
পচা গোবর	৫-১০ টন
ইউরিয়া	১২৫ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমওপি	৭৫ কেজি

জমি চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ পচা গোবর সার ছিটিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এমপি সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার বীজ বপনের ৪০ দিন পরে আগাছা নিড়ানির পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সার উপরি প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল।

অন্যান্য পরিচর্যা

আগাছা দমন

গাছের দৈহিক ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সময়মত আগাছা নিড়ানো ও গাছ পাতলাকরণ জরুরি। সাধারণত বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর আগাছা নিড়ানো উচিত। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণ উচিত। এ ফসলের জন্য ২-৩টি নিড়ানি ও পাতলাকরণ প্রয়োজন।

সেচ ও নিষ্কাশন

মাটিতে রস না থাকলে বীজ বপনের পর হালকা সেচ দেয়া ভাল। মাটির ধরন ও বৃষ্টির উপর নির্ভর করে জমিতে মোট ২-৩টি সেচ দেয়া যেতে পারে।

রোগ ও পোকামাকড়

কালজিরার জমিতে তেমন একটা পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবে কিছু ছত্রাকের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দিলে রিডোমিল গোল্ড বা ডাইথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের ১৩৫-১৪৫ দিনের মধ্যে গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং এ সময় কালজিরা সংগ্রহ করতে হয়। এ সময় গাছ উত্তোলনের পর শুকানোর জন্য রোদে ছড়িয়ে দিতে হয়।

মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ

হাত দ্বারা ঘসে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বাহির করা হয়। বীজগুলো পরিষ্কার করে এবং ভালভাবে রোদে শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে পলিথিনের ব্যাগে/প্লাস্টিকের পাত্রে/টিনের কৌটায় রেখে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়। চটের বস্তায় কালজিরা রাখলে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

মেথীর জাত

বারি মেথী-১

গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি । প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। প্রতিটি পডে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামী বর্ণের। এই জাতে রোগবালাই নেই বললেই চলে। প্রতি হেক্টরে এর ফলন ১.৫-১.৮ টন।

বারি মেথী-১

বারি মেথী-২

গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৬-৭টি। মেথীর ফলকে 'পড' বলে। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৬০-৬৫টি। প্রতিটি পডের দৈর্ঘ ৯-১০ সেমি যার প্রতিটিতে ১০-১২টি বীজ থাকে। প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা ৫-৬টি । বীজ হলুদাভ বাদামী বর্ণের। এই ফসলের রোগবালাই কম। প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৮-২.১ টন।

বারি মেথী-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি

মেথী রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। প্রায় সব প্রকার মাটিতে চাষ করা সম্ভব। তবে পলি দোআঁশ মাটি থেকে বেলে দোআঁশ মাটি মেথী চাষের জন্য বেশি উপযুক্ত। মেথী গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্লতা (পিএইচ ৬-৭) পরিমিত মাত্রায় হলে ভাল হয়।

জমি তৈরি ও বীজ বপন পদ্ধতি

মেথী চাষের জন্য জমি খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে যাতে কোন প্রকার ঢেলা না থাকে। মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দেয়া প্রয়োজন হতে পারে। মাটিতে সরাসরি বীজ বুনে মেথী চাষ করা যায়। আবার তৈরিকৃত জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেমি বজায় রেখে বীজ বপন করা যায়। পরে যখন চারা গাছ ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হয় তখন গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে। সাধারণত ১ মিটার প্রস্থ ভিটিতে বীজ বপন করতে হয়। সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি ভিটির মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

বীজের পরিমাণ

হেক্টরপ্রতি ১০-১২ কেজি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার উপর নির্ভরশীল।

প্রতি হেক্টরে নিম্নলিখিত পরিমাণ সারের প্রয়োজন হয়।

সারের নাম	পরিমাণ
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি
এম ও পি	১৩৫ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর সার, টিএসপি এবং এমওপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে এবং ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪টি নিড়ানি দিতে হবে। সেচের পর 'জো' আসা মাত্র মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। এতে মাটির ভিতর আলো বাতাস প্রবেশ করে এবং মাটি অনেকদিন রস ধরে রাখতে পারে যা পরবর্তী সময়ে গাছের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে। মাটির প্রকারভেদে জমির সেচ প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নালা দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

'বারি মেথী-২' এ কোন মারাত্মক রোগ হয় না বললেই চলে। তবে কোন রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রিডোমিল বা রোভরাল মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। এ জাতে তেমন কোন পোকার আক্রমণ হয় না।

ফসল সংগ্রহ

বীজ বপনের পর থেকে ১১০-১২০ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত যখন শুঁটিসমূহ (পড) হলদে বাদামী ও কালচে বর্ণ ধারণ করে তখন গাছ কাটা হয়। এই কাটা গাছ ১-২ দিন ছায়ায় রাখতে হয়। এরপর মাড়াই করার জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করে বাতাসমুক্ত টিন, মাটির পট, পলিব্যাগ ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করা হয়। বীজের রং ও সুগন্ধ বজায় রাখার জন্য সঠিক প্রদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা উচিত।

ফলন

হেক্টরপ্রতি ১.৮-২ কেজি।

আলুবোখারা

আলু বোখারা (*Prunus domestica*) বাংলাদেশের স্বল্প ব্যবহৃত একটি উচ্চমূল্যের মসলা ফসল। সাধারণভাবে ককেসাস এলাকা ও এশিয়া মাইনর আলুবোখারার উৎপত্তিস্থল। আশ্চর্য রকমের সুস্বাদু ও রসালো এ ফল ফ্রেশ খাওয়া চলে অথবা চিনি, মরিচ ও সরিষার তৈল সহযোগে চাটনির মত করে অথবা বিভিন্ন উপাদান যোগ করে রান্না করে খাওয়া হয়। আলুবোখারা দিয়ে জ্যাম, জেলি, চাটনি, কেক, আচার প্রভৃতি তৈরি করা যায়। মধ্য ইংল্যান্ডে সিডার জাতীয় এলকোহলিক বেভারেজ যা প্লাম জাবকাস নামে পরিচিত তা এই আলুবোখারা থেকেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। শুকনা আলুবোখারা (যা প্রুন নামে পরিচিত) মিষ্টি, রসালো এবং এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এতে খাদ্য শক্তি কম (৪৬ কি.ক্যাল.) থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাশিয়াম, ফ্লোরাইড ও লৌহ রয়েছে যা দেহকোষের সুরক্ষার জন্য উপযোগী। এর অন্যান্য ভিটামিনসমূহ শ্বেতসার মেটাবলিজমে ও হাড়ের গঠনে ফসফরাস এবং ভিটামিনকে রক্ত জমাট বাঁধাতে সহায়তা করে ও বৃদ্ধদের আলঝেইমা রোগ প্রতিরোধ করে।

বারি আলুবোখারা-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত 'বারি আলুবোখারা-১' জাতটি ২০১৩-১৪ সালে অনুমোদন করা হয়।

এদেশের মাটিতে ভাল ফলন দিচ্ছে। এর গাছ মাঝারি আকারের, ৫-৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে শাখা ছাঁটাই না করলে এর গাছ ১২ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ জাতটিতে ফুল আসে আর জুন মাসে ফল পাকে। আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল রঙের মাঝারী আকারের (৮.৬৬ গ্রাম/ফল) সুগন্ধিযুক্ত ফল। এর ফলের খাদ্যাংশ বেশি (৯৭.৪%) এবং মাঝারী টক মিষ্টি স্বাদের (টিএসএস ১১.০)। গাছে প্রচুর ফল ধরে (গড়ে ১৪০০টি), ১১.৩ কেজি বা হেক্টরপ্রতি ৭.০৩ টন। এ জাতটিতে রোগবালাই এর আক্রমণ অনেক কম।

বারি আলুবোখারা-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

আলুবোখারা বা (Plums) রোজেসি (Rosaceae) পরিবারভুক্ত একটি ফল জাতীয় মসলা ফসল। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক জাতসমূহের ফল বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে ধরে থাকে, যেমন- তাইওয়ানে জানুয়ারিতে, যুক্তরাষ্ট্রে এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে। এর ফল মধ্যমাকৃতির ১-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত, গোলাকার ও ওভাল হয়ে থাকে।

আবহাওয়া ও মাটি

সাধারণত শীত প্রধান ও অবউষ্ণ আবহাওয়া আলুবোখারা চাষের জন্য উপযোগী। তার ০-৭.২ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। অবউষ্ণ এলাকার জন্য শীতকালে শৈত্যায়ন হয়ে শীতের পর ফুল আসে এবং ফলধারণ করে। আলুবোখারা রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া ও সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী ও পর্যাপ্ত সুর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

জমি তৈরি

যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি আলুবোখারা চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পারিষ্কার করে নিলেই চলবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে আলুবোখারা চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভূজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলুবোখারা চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৩-৪ মিটার দুরত্বে ৬০×৬০×৬০ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের

উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা

এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে নিয়মিত ও পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১০ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া(গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০-৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

আগাছা দমন

গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমত সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও আন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ

চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

'বারি আলুবোখারা-১' এ রোগবালাই তেমন দেখা যায় না। শুধু পাতার দাগ বা লিফ স্পট রোগ দেখা যায়। রিডোমিল বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করেই তা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

আলুবোখারার ফল নন-ক্লাইমেক্টরিক হওয়ায় গাছ থেকেই ভালভাবে পাকার পর তা সংগ্রহ করতে হয়। আলুবোখারার ফল ভালভাবে পেকে গাঢ় লাল বা হালকা খয়েরী রং ধারণ করলে এবং ফল নরম হলেই সংগ্রহ করা উচিত। হালকা লাল বা হলুদ আবস্থায় সংগ্রহ করা হলে তা অত্যন্ত টক বা হালকা তেতো স্বাদেরও হতে পারে। 'বারি আলুবোখারা -১' এর বা এ জাতের প্রতি পুর্ণবয়স্ক (১৫-২০ বছর) গাছে দেড় থেকে তিন হাজার পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭ থেকে ১০ টন ফ্রেশ পাকা ফল পাওয়া যেতে পারে।